সপ্তম অধ্যায়

আত্মজীবনী ও ঔপন্যাসিকতার দ্বৈতাদ্বৈত

আত্মজীবনী এবং উপন্যাস এই দু'টি মাধ্যম শিল্প সাহিত্যের দুটি দিককে নির্দেশ করে। যদিও দু'টিই জীবনের আধারেই রচিত। পার্থক্যটা এই যে আত্মজীবনী ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব জীবনের আত্মগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে কেন্দ্র করে লেখা হয়। আর উপন্যাস কিছু চরিত্র অবলম্বন করে নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-আততি-সংশ্লেষণের ভিত্তিতে সামগ্রিক জনজীবনের ছবি পরিস্ফুট করে। কিন্তু আত্মজীবনী এবং উপন্যাস এই দু'টি বিষয় যখন যুগ্মভাবে একটি শৈল্পিক রূপ পায় তখন তার মধ্যে দ্বৈতাদ্বৈত সম্বন্ধ স্বাভাবিকভাবে স্পষ্ট হবেই। পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলোর আলোচনায় আত্মজৈবনিক উপাদানসম্পন্ন উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য, নিজস্ব ধর্ম, বিষয়বিন্যাস এবং শৈলীগত রূপ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু কোনো উপন্যাসকে যখন আত্মজৈবনিক উপাদানের বিশিষ্টতায় চিহ্নিত করি, তখনই পাঠকের কাছে বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা উত্থাপিত হয়। উপন্যাসটি কেন আত্মজৈবনিক। এটাকে যখন আমরা সাহিত্যিক 'Genre' (শ্রেণি) হিসেবে দেখছি। তখন সেটার মধ্যে 'elaborate structure' অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিন্যস্ত একটা কাঠামো আছে কিনা সেটা লক্ষ করতে হয়। কারণ যিনি আত্মজীবনী বা আত্মজীবনের উপাদানকে কেন্দ্র করে শৈল্পিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করছেন সেটা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক, সেটাকে যদি সুনির্দিষ্ট একটা কাঠামোর মধ্যে বিন্যস্ত করা না হয়, তাহলে সেটা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। আর এই কাঠামোর মধ্য দিয়েই লেখকের লেখার পেছনে যে একটা অভিপ্রায় অন্তর্নিহিত থাকে সেটা সার্থক হয়ে উঠতে পারে। কাঠামোর মধ্য দিয়েই একটি পাঠকৃতির (Text) সংজ্ঞাটাও ঠিক করে নেওয়া যায়। যে-লেখক লিখছেন তাঁর অভিপ্রায়টা প্রথম বুঝে নিতে হয়। কেননা প্রতিটি লেখার পেছনে লেখকের একটি 'motive' বা উদ্দেশ্য কাজ করে। প্রত্যেক সচেতন শিল্পীর সার্থক শিল্পেই একটা motive লক্ষ করা যায়। motive ছাড়া কোনও পাঠকৃতি নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করতে সক্ষম হয় না। আর আত্মজীবনী বা আত্মজৈবনিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে লেখকের একটা নৈতিক

উদ্দেশ্য (Ethical motive) কাজ করে। সেটা হল নিজের ভালো-মন্দ বা শুভাশুভ বোধ প্রকাশ করা। এই প্রকাশ করা শুধু নিজের অতীত জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনার ঘনঘটা নয়। বরং জীবনকে ফিরে দেখার প্রবণতা থেকে যখন তিনি রচনা করছেন তখন নিজেকেই নতুন করে নির্মাণ করতে হচ্ছে। আত্মজীবনী যিনি লিখছেন, তিনি নিজস্ব একটা বিষয়ী সত্তা তৈরি করছেন। নিজের জীবন সম্পর্কে, চৈতন্য সম্পর্কে একটি স্পষ্ট বিন্যাস তাঁকে নিয়ে আসতেই হয়। আর তখন আত্মজীবনীমূলক রচনার ক্ষেত্রে 'retrospective awareness' অর্থাৎ বিগত কালের অনুভব সম্পর্কিত সচেতনতা সক্রিয় থাকে। আত্মজীবনীমূলক রচনার ক্ষেত্রে এই 'retrospective awareness' টা সবসময় থাকতেই হয়। কারণ অনেকদিন পর লেখক নিজের জীবনে ঘটে-যাওয়া এবং তাঁর আশেপাশের বিষয়গুলোকে কাঠামোর মধ্যে বিন্যস্ত করতে সচেষ্ট হন। হয়তো অতীতে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা, কিছু বিষয় লেখকের স্মৃতিতে উদ্ভাসিত হচ্ছে। তখন কিছু ঘটনা তাঁর কাছে হয়তো গৌণ মনে হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে এগুলোকে নিয়ে যখন ভাবছেন, তখন অনেক গৌণ ঘটনা তাঁর কাছে হয়তো প্রধান হয়ে উঠছে এবং প্রধান ঘটনা গৌণ রূপে ধরা দিচ্ছে। আর আত্মজীবনীমূলক সন্দর্ভে (Autobiographical Discourse) তখনই retrospective awareness প্রযোজ্য হয়ে ওঠে। এবং সঙ্গে immediate এবং non-immediate-এর প্রশ্ন এসে যায়। আসে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ এর ধারণা। আত্মজীবনী লেখার জন্য একটা 'Self awareness' অর্থাৎ আত্ম-সচেতনতা দরকার। এই সচেতনতার ফলেই লেখক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিষয় নির্বাচন, মুখ্য ও গৌণ সম্পর্কের বিন্যাস নিয়ে আসতে সক্ষম হন। তার মানে স্পষ্ট হয় সবকিছুতে ঘটে চলা ভাঙাগড়ার মাধ্যমে সক্রিয় একটি বিনির্মাণ পদ্ধতি (Deconstruction method)। বিনির্মাণের মাধ্যমে পাল্টে নিতে হয় লেখকের নিজের অবস্থানগত বিন্যাসকেও। ভাঙা গড়ার মাধ্যমে বিনির্মাণের স্বাধীনতাটুকু শিল্পের খাতিরে আত্মজীবনীকারের থাকতেই পারে। এভাবেই লেখক নিজস্ব বিষয়ের পরিমণ্ডলে একটা নতুন কাঠামো বিন্যস্ত করে নেন।

আত্মজীবনীতে লেখকের সমসাময়িক সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কালের উল্লেখ থাকে। অর্থাৎ লেখকের সমসাময়িক কোনো ঘটনা, সেটা পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক যাই হোক না কেন, তার উল্লেখ ও বিশ্লেষণ থাকে। তথ্যের প্রয়োজনে, সামগ্রিকতার প্রয়োজনে এই 'referentiallity' অর্থাৎ উল্লেখযোগ্যতা প্রয়োজনীয় ও অনিবার্য।

লেখার পেছনে লেখকের যে অভিপ্রায় থাকে তার স্বরূপ কী? নিজের বিগত জীবনের উল্লিখিত

ঘটনা, অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, বিস্তৃত জীবন থেকে আহৃত তাৎপর্যের সন্ধান, সত্য বাচন প্রকাশের অভিপ্রায়। এই অভিপ্রায়টা যথাযথভাবে বোঝা গেল কিনা, তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর অভিপ্রায়টা সামগ্রিক পাঠকৃতির অধ্যয়নের পর পাঠক অনুভব করে উঠতে পারলেন কিনা সেটাই বড় কথা। দেখতে হয়, লেখকের অভিপ্রায়ও ঠিকঠাক শেষপর্যন্ত রক্ষিত হল কিনা। এখানে লেখকের 'সত্য' এর নিষ্কর্ষ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা দেখা দেয়। এই 'সত্য' এর প্রতীতির মধ্যে দার্শনিক অন্বীক্ষাই প্রযোজ্য। অর্থাৎ যে-সত্যটা তিনি প্রকাশ করতে যাচ্ছেন সেটা কী ধরনের সত্য এবং এই সত্য কত রকমভাবে আমাদের কাছে ধরা দিচ্ছে। যে-কোনও লেখার কাছে একটি মৌল সত্য পাঠক আশা করেন। কিন্তু Autobiographical writing থেকে বিশেষ উচ্চতর সত্য আশা করা হয়। যে-কোনও প্রতিবেদন থেকেই লেখকের ধ্যান-ধারণায়, জগৎ ও জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পাঠক একটি সত্য আবিষ্কার করতে চায় আত্মজীবনীও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু সত্য আবিষ্কারের পথে পাঠককে লেখকের অভিপ্রায়ের উপর আস্থা রেখেই চলতে হয়। কারণ রচনায় যে-তথ্য পাঠকের কাছে ধরা দেয়, সেটাকে আক্ষরিকভাবে যাচাই করার গুরুত্ব বা দরকার তেমন নেই। কারণ 'The truth of self'-ই সারকথা। সত্তার যে-সত্য, সেখানে তথ্য কিছু না কিছু তো থাকবেই। কিন্তু তথ্যের ঘেরাটোপে লেখককে বন্দি হলে চলবে না। এই ক্ষেত্রে সমালোচকের ব্যাখ্যা প্রযোজ্য মনে হয় —

> "*Autobiographical truth should be literally verifiable – this would, after all, undermine the idea that the truth of the self is more complex than 'fact'.*"[১]

অর্থাৎ আত্মজীবনীর যেটা সত্য সেটা আক্ষরিকভাবে যাচাই করলে, সেটা ঠিকভাবে ধরা নাও যেতে পারে। কারণ, কোনও একজন ব্যক্তির সামাজিক পরিচয় যা-ই হোক না কেন, তিনি যখন লিখছেন, তিনি তো তথ্যের উল্লেখ করছেনই। তথ্যের আবরণের মধ্য দিয়ে যে-সত্য বেরিয়ে আসে, সেই সত্য অনেক সময় সহজ-সরল না হয়ে জটিলও হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু পাঠকৃতির তাৎপর্যের মধ্যে লেখকের যে-অভিপ্রায় টের পাওয়া যায়, তার স্বভাব পুরোপুরি আলাদা। সেখানে লেখকের আন্তরিকতা অনুভূত হচ্ছে কিনা এটাই লক্ষ করার বিষয়। আর যদি এটার মধ্যে লেখকের অভিপ্রায়ের স্বচ্ছতা, আন্তরিকতা পাঠক অনুভব করে, সেটাকেই আত্মজীবনীর শৈল্পিক প্রয়োজনীয়তা বলে ধরে নিতে হবে।

'Concept of intention' – অর্থাৎ অভিপ্রায়ের যে অর্থ যে-ধারণা সমালোচনা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে

স্থান লাভ করেছে। তারই আলোকে মনের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দেয়, লেখক কী বলতে চাইছেন 'meant to say' – অর্থাৎ কী গভীর অর্থ প্রকাশ করতে চাইছেন। এটা হয়তো সমালোচনাত্মক পদ্ধতি। কিন্তু পরবর্তীকালে আমেরিকায় 'New critics' বলে এক গোষ্ঠী এই ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন যে এভাবে লেখকের অভিপ্রায় বা তাৎপর্য প্রকাশের কারণ বোঝা যায় না। তাঁদের বক্তব্য ছিল লেখার মধ্যে অভিপ্রায়টা প্রযোজ্য কিন্তু অভিপ্রায় থাকাটাই শেষ কথা নয়। আত্মজীবনীমূলক সমালোচনার ক্ষেত্রে অভিপ্রায় যেমন লক্ষণীয় তেমনি যে-মানুষটি লিখছে তার চরিত্র এবং ব্যক্তিত্বও লক্ষ করতে হয়। তাঁর জীবনপ্রণালী এবং জীবনচিত্র কীরকম ছিল সেটাও দেখার বিষয়। তারা মন্তব্য করেছিলেন –

> "*In autobiographical criticism, the intentions and character of the person, conceptualised in a more psychological register.*"[২]

অর্থাৎ লেখকের ব্যক্তিত্ব, যিনি লিখছেন তাকে একটি concept বা ধারণার মধ্যে নিয়ে আসা যাচ্ছে কিনা। মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাসের মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে ধারণাবদ্ধ করে বোঝা যাচ্ছে কিনা এটা লক্ষণীয়। আর এই বিন্যাসের উপরই তাঁর আত্মজীবনীর যে-সত্য তাও নির্ভর করে। Roy Pascal একজন সমালোচক, যিনি আত্মজীবনীমূলক রচনার ক্ষেত্রে তিনটি মুখ্য শর্তের কথা উল্লেখ করেছিলেন, 'Design and truth in Autobiography' গ্রন্থে, –

> "*The first condition is the seriousness of the author, the seriousness of his personality and of his intention in writing.*"[৩]

আত্মজীবনীমূলক সমালোচনায় বারবার পুনরাবৃত্ত হতে দেখা যায় 'Tenet' অর্থাৎ ধারণা। সেটি হল, লেখকের মধ্যে লক্ষ করা যায় যে, 'inner compulsion to write of the self' (p-3)। অর্থাৎ সত্যিকারের যিনি আত্মজীবনীকার তিনি মনের ভেতর থেকে একটা বাধ্যতা বোধ করেন। নিজের সত্তাকে, নির্মাণ করার একটা বোধ। তিনি নিজের জীবন সম্পর্কে, চৈতন্য সম্পর্কে নিজের সত্তাকে আবিষ্কার করতে তৎপরতা বোধ করেন। তিনি নিজেকে লিখতে চান। অর্থাৎ নিজের বিষয়ে সত্তার বিষয়ে লেখা এবং সত্তাকে নির্মাণ করা এক নয়। তাঁর মধ্যে সূক্ষ্ম কিছু জটিলতা বিদ্যমান। দার্শনিক ফুকো বলেছিলেন 'I author myself' — অর্থাৎ আমিই আমার নিজের সত্তার লেখক। তাঁর এই ছোট অথচ গভীর বিখ্যাত স্বঘোষিত শব্দগুচ্ছটি

আত্মজীবনীমূলক রচনায় সত্তাকে নির্মাণ করার শর্তসাপেক্ষ মনে হয়। পিছন ফিরে গভীরভাবে চৈতন্যলোকে স্মৃতিতে উদ্ভাসিত জীবনতথ্যের উপকরণে যখন নিজেকে লেখক নির্মাণ করছেন তখন সেখানে তাঁর অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে নির্মাণের কথাটাও বলতে হয়। ব্যক্তিভেদে, চরিত্রভেদে এবং দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্যে প্রত্যেক মানুষের বিশেষ করে লেখকদের জীবনের গল্পও ভিন্ন। যখন সত্তার গল্পটি লেখার ভেতর থেকে তাঁর চৈতন্যলোকের উপলব্ধ গভীর তাৎপর্যটি প্রকাশিত হতে থাকবে তখনই তা শিল্পমূল্যে নান্দনিকতায় হবে খাঁটি প্রকৃত এবং সত্যিকারের। জীবনের ঘটনার তথ্য, জীবনের সত্য এবং উপলব্ধ চৈতন্যের গভীর তাৎপর্যকে গ্রহণ করার মধ্যে যে-যুক্তি নিহিত তাই নন্দনতাত্ত্বিক।

আত্মজীবনীমূলক রচনায় 'Authentic' অর্থাৎ প্রকৃত সত্য বা প্রামাণ্যতা রক্ষা করে চলতেই হয় লেখককে। এবং তিনি নিজের যে self এর কথা লিখছেন, সেটার মধ্যেও দু'টি সত্তা লক্ষ করা যায়। একটি 'private self' বা ব্যক্তিগত সত্তা এবং 'public self' বা সামাজিক সত্তা। সহজ কথায় সত্তার একটা দিক আছে বাইরের এবং অন্যটা একান্তই নিজের ভেতরের দিকে যা কেউ দেখতে পায় না। লেখক ইচ্ছে করে হয়তো চাপিয়ে রাখেন তা নাও হতে পারে। কিন্তু এই ব্যক্তিগত সত্তায় প্রবেশাধিকার করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয় বা অধিকারও নেই। আর একটা সত্যিকারের আত্মজীবনীমূলক রচনায় এই ব্যক্তিগত সত্তার স্ফুরণ কোথাও কোথাও থাকতে পারে। যেমন গোপাল হালদারের 'ত্রিদিবা'য় অমিতের নানা ব্যক্তিক সম্পর্কের বিন্যাসের ইঙ্গিতে ধরা যায়। চরিত্রের নিজের সঙ্গে নিজের মুখোমুখি হওয়ার যে-বিন্যাস তার মধ্যেই তা স্পষ্ট হয়। কারণ মানুষকে কখনও তো একবার হলেও ক্ষণিকের জন্যও সত্তার মুখোমুখি হতে হয়। আর 'public self' বা সামাজিক সত্তার সম্পর্ক সমাজ, রাজনীতি এবং রাষ্ট্রিক বিভিন্ন অনুষঙ্গে জড়িত। সেটা প্রকাশ্য। কিন্তু 'private self' এর ক্ষেত্রে লেখককে খুব সচেতন থাকতে হয়। আত্মজীবনীর উপাদানে সমৃদ্ধ এই উপন্যাসের ক্ষেত্রে লেখকের 'public self' টিই প্রকাশ্যভাবে বেশি লক্ষ করা যায়। এবং ব্যক্তিগত সত্তা বা private self-টি তাঁর চৈতন্যের গভীর থেকে প্রচ্ছন্নভাবে ইঙ্গিতে, আকারে সমান্তরালতা রক্ষা করে চলে।

আদর্শ আত্মজীবনী হল সেটাই, যেটাতে মানবতার অভিব্যক্তি ঘটবে। সামগ্রিকতার প্রতি লেখকের আত্মিক সম্মতি থাকবে এবং থাকবে সমস্ত কিছুর প্রতি 'harmonious perfection' অর্থাৎ সমস্ত কিছুতে পরিশীলিতভাবে যে একটি বিশুদ্ধ সুষমতা নিয়ে আসে। যেখানে সামগ্রিক মানবিকবোধে, যখন একজন

ব্যক্তি নিজেকে নির্মাণ করে চলেন, তখন নিজের অজান্তেই সচেতন হয়ে ওঠেন, মানবসমাজের শুদ্ধতার জন্য আবেগে। এবং ব্যক্তিজীবন অতিক্রম করে সমগ্রতার প্রতি, সুষমতার প্রতি শুদ্ধতার আবেগ তাঁকে তাড়িত করে। ফলে ব্যক্তির সমাজের সঙ্গে একটি সুসাম্য বা সামঞ্জস্যের ভাব পরিস্ফুট হয়। এটা হয় বড় লেখকদের ক্ষেত্রেই। অর্থাৎ যারা 'ছোট আমি' কে অতিক্রম করে 'বড় আমি'তে উত্তরণ করতে পেরেছেন, তাদের রচনায় এই অভিব্যক্তি পরিপূর্ণতা পায়।

আত্মজীবনীর উপাদান, রীতি-কৌশল এবং কিছুটা শর্ত অবলম্বন করেই বিষয়ভিত্তিক বর্গীকরণে আত্মজৈবনিক উপাদান সমৃদ্ধ ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনের পদযাত্রা। তাই তার মধ্যে আলোচ্য আত্মজীবনীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগত ধর্ম দৃষ্টিগোচর হবেই। ফলে এই ধরনের রচনায় আত্মজীবনী ও ঔপন্যাসিকতার (উপন্যাস হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া বা novelisation) দ্বৈতাদ্বৈত বা 'Duality' পরিলক্ষিত হয়। কারণ এই ধরনের রচনায় একের মধ্যে দু'টি বিষয় প্রত্যক্ষ করা যায়। একদিকে আত্মজীবনের উপকরণে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের কিছুটা ছায়াপাত। আবার ঔপন্যাসিক প্রক্রিয়ায় (novelisation) উপন্যাস শিল্পের স্বাতন্ত্র্য।

আত্মজৈবনিক ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনে আমরা লেখকের প্রকাশ্য উপস্থিতি বা লেখকের সত্তাকে হুবহু আবিষ্কার করতে পারি না। সমালোচক 'Genette' একটি 'Narrative' এ 'Narrator' এর তিন রকম উপস্থিতির কথা বলেছিলেন। প্রথমত Heterodiegetic অর্থাৎ আখ্যানে ন্যারেটরের অনুপস্থিত উপস্থিতি। দ্বিতীয়ত Homodiegetic অর্থাৎ উত্তম পুরুষে ন্যারেটরের উপস্থিতি। তৃতীয়ত Autodiegetic অর্থাৎ আখ্যানে বিবরণদাতারূপে শুধু নয় মুখ্য চরিত্রের অন্তরালে লেখকের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। আর এখানে Genette এর কথা প্রযোজ্য মনে হয়। অর্থাৎ এই ধরনের উপন্যাসে লেখকের প্রতিস্থাপিত মুখ্য চরিত্রের মধ্যে চারিত্রিক কিছু বৈশিষ্ট্য, ভাবাদর্শ, জীবনদর্শনের যে-ভাব পরিলক্ষিত হয়, তার মধ্যে লেখকের প্রতিষ্ঠিত প্রতিকল্প সত্তা অর্থাৎ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রের ছায়াঞ্চল থেকে তাঁকে আলাদা করা যায় না কখনো কখনো। এই ধরনের রচনায় তাই পার্থক্য ও সমান্তরালতার প্রতীতি লক্ষ করা যায়। তিনি ধরা দিয়েও অধরা হয়ে পড়েন। কারণ তিনি এখানে আত্মজীবনের উপকরণকে ধারণ করে, নিজের বিস্তৃত জীবন অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির নির্যাসকে অবলম্বন করে সমগ্রতাকে ধারণ করতে উদ্যোগী থাকেন। কারণ তিনি বিশেষভাবে নিজের কথা নয়। বরং নিজের ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও পর্যবেক্ষণের, নিজস্ব বিস্তৃত জীবন পরিসরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে অপর অন্যান্য জীবন-পরিসরগুলোর ব্যাপ্তি ঘটাতে চান।

সমস্ত জীবনে যেসব মানুষের জীবন সংগ্রাম, সুখ-দুঃখ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি করেছেন, যার দ্বারা তাঁর চেতনা-বিশ্বে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা জমাট বেঁধেছে এবং যে অভিজ্ঞতায় তিনি জীবনের, সমাজের, জীববিশ্বের বৃহৎ তাৎপর্যের সন্ধান লাভ করেছেন তাকেই সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণে ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনে প্রতিস্থাপন করতে উদ্যোগী হন। বিস্তৃত জীবনবোধের বিশ্লেষণী পাঠ আত্মজীবনীর পরিসরে ততটুকু প্রসারিত করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই বিস্তৃত জীবনবোধে সচেতন সমাজতাত্ত্বিকের দার্শনিকমূলক অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতেই, আত্মজীবনের বিশেষ মুহূর্ত বা উপাদানকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঔপন্যাসিক প্রক্রিয়ায়, আত্মজীবন এবং উপন্যাসকে যুগ্মভাবে প্রকাশের উদ্যোগ নেন।

আত্মজৈবনিক উপাদান সমৃদ্ধ উপন্যাসে আত্মজীবনী রচনায় লেখকের যে একটা অভিপ্রায়ের উল্লেখের কথা বলা হয়েছে সেটাও লক্ষ করা যায় গভীর অধ্যয়নে। এই ধরনের উপন্যাসকে লেখকের বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বলেই মনে হয়। আর এই অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্যটা হল সচেতন শিল্পী নৈতিক মূল্যবোধের তাগিদে, বিস্তৃত জীবন অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি, বিশ্বাসকে সম্বল করে সমাজ-পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং গভীর জীবনবোধে যুগমানসের সামগ্রিক প্রতিচ্ছবিকে বা মানবতার বোধে আদর্শ আত্মজীবনীর শর্তটি,—

> "*Expressing humanity's 'approaches to totality and to a full, harmonious perfection*"[৪]

সমালোচকগোষ্ঠীর উপরোক্ত এই ধারণাটিকে পরিপূর্ণতা দেন। পার্থক্যটা এই যে, এটার মধ্যে ঔপন্যাসিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। লেখকের সমস্ত জীবনব্যাপী অর্জিত অভিজ্ঞতা, সঞ্চিত উপলব্ধি ও গৃহীত বিশ্বাস সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। তাঁর নিজস্ব জীবনের বা সত্তার আত্মিক বোধ, জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনার বিশেষ মুহূর্ত এবং জীবনে নিষ্কর্ষ তাৎপর্য উপাদানরূপে স্পষ্ট হয়ে লেখকের মূল বক্তব্য সম্প্রসারিত হয়। আত্মজীবনের উপাদানকে কেন্দ্র করে সাহিত্যিক শর্তে গ্রহণ, বর্জন, সংযোজন ও পরিমার্জনের প্রক্রিয়ায় তার মধ্যে ঘটে উপন্যাসীকরণ বা novelisation।

আলোচ্য 'শ্রীকান্ত', 'ত্রিদিবা'-এর তিনটি পর্ব 'একদা', 'অন্যদিন', 'আর একদিন' এবং 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত', 'মোহানা' -ত্রয়ী : এই উপন্যাসগুলোর মধ্যে আমরা লেখকের কিছু কিছু ব্যক্তিগত জীবনের উপাদান লক্ষ করি। শ্রীকান্তের শৈশবের পিসেমশাইর বাড়িতে তাঁর অবস্থানের বৃত্তান্ত, বন্ধু ইন্দ্রনাথ, ছোড়দা,

যতীনদা বা রাজলক্ষ্মীর কথা শরৎচন্দ্রের জীবনেরই কিছু ঘটনা রূপান্তরিত ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। চারিত্রিক দিক দিয়ে শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্র শ্রীকান্ত উদাসীন প্রকৃতির, ভবঘুরে, পরদুঃখকাতর, বিশেষভাবে নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও দরদী মন ছিল এবং সে ছিল ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত। তা শরৎচন্দ্রেরই প্রকৃতিগত রূপ। ভবঘুরে জীবনে যেসব জায়গার বর্ণনা শ্রীকান্তে আছে সেগুলিতে বাস্তবে শরৎচন্দ্রের জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে। কিন্তু কিছু উপাদানের ঐক্য থাকলেও এটা লেখকের ঔপন্যাসিক প্রতিবেদন রূপেই পাঠকের কাছে লেখক উপস্থাপন করেছেন। আত্মজীবনীর ক্ষেত্রে আরেকটি কথা বলা হয়েছে, —

> "*Because Autobiography ex hypothesi means that the author is identical with the autobiographical subject.*"[৫]

অর্থাৎ আত্মজীবনীর বিষয় হিসেবে পূর্ব পরিকল্পিত বিষয় হচ্ছে লেখকের ব্যক্তিসত্তার নির্মাণ। যিনি আত্মজীবনীকার তিনি নিজেকেই লেখার জন্য নির্মাণ করার তাগিদে একটা নিজস্ব বিষয় তৈরি করে নেন। আত্মজীবনীর বিষয়ী সত্তা এবং লেখক এখানে অভিন্ন সত্তা রূপেই প্রকাশিত হন। কিন্তু আত্মজীবনের উপাদানকে কেন্দ্র করে যখন লেখক ঔপন্যাসিক বয়ান তৈরি করছেন তখন তিনিও আত্মজীবনীকারের মতোই অনেকদিন পর নিজের অতীত জীবনে তাকিয়ে তাৎপর্য সন্ধান করে চলেছেন। কিন্তু জীবনে যেভাবে ঘটনা ঘটেছিল সেভাবে তো বয়ান তৈরি হয় না। বয়ানে বাহুল্য কিছু বাদ দিতে হয়, আত্মজীবনীতে হয়তো কাল্পনিক কিছু নতুন যোগ হয় না 'Authentic' অর্থাৎ প্রামাণ্যতার খাতিরে। কিন্তু আত্মজীবনের আধারে রচিত ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনে শৈল্পিক মূল্যবোধে ও নান্দনিক সুষমতার জন্য কল্পনার সাযুজ্য ঘটে থাকে। অনেক কিছু তথ্যকে গ্রহণ করেও কল্পনার সংযোজনে তাকে পূরণ করা হয়। এবং অনেক পরে অতীত জীবনের মূল্যায়নে জীবনের যে তাৎপর্যগুলো নিষ্কর্ষিত হয়, সেই তাৎপর্যের উপর নির্ভর করেই তার মধ্যে একটি বিন্যাস আনা হয়। এভাবেই আত্মজীবনীর মতো আত্মজৈবনিক উপাদান সম্পন্ন শৈল্পিক প্রতিবেদনেও একটি বিন্যস্ত কাঠামো তৈরি হয়। তখন ঘটনা বা কাহিনি নয় তাৎপর্যের বিন্যাসটাই আসল, খাঁটি হয়ে ধরা দেয়। এই বিন্যাসকে শ্রীকান্তের মধ্যে খুব সুন্দরভাবে লক্ষ করা যায়। শ্রীকান্ত বা শ্রীকান্তের স্রষ্টা জীবনের অপরাহ্নে জীবনের কথা বলতে বসেছিলেন। তখন নির্মাণশিল্পী শরৎচন্দ্রের বক্তব্যে উপন্যাসের বিন্যাসের বিন্যস্ত ভাবটিই বিধৃত হয়েছে প্রতিসত্তা চরিত্র শ্রীকান্তের ভাষ্যে। জীবনের এই যে ঘটনাগুলো যেমন করে একটার পর একটা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে যেভাবে বলছেন ঠিক সেভাবে ঘটেনি। 'এইসব এলোমেলো

ঘটনাগুলো' লেখকের বক্তব্যে এখানেই স্পষ্ট হয়ে পড়েছে উপন্যাসের রচনা-রীতির প্রকরণ। অর্থাৎ বিন্যস্ত কাঠামোর বিন্যাস। এবং এই বিন্যাসের মধ্যে 'Author' এবং subject অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তার সাযুজ্যও স্পষ্ট নয়। এখানে প্রশ্ন জাগে তাহলে শরৎচন্দ্রই কি শ্রীকান্ত। কিন্তু শরৎচন্দ্রই তো শ্রীকান্ত নয়; আত্মজৈবনিক উপাদানের সাযুজ্যে অনেকখানি শরৎচন্দ্র বটে। কিন্তু শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তকে এখানে শৈল্পিক মূল্যবোধে গ্রহণ, বর্জন, পরিমার্জন এবং সংযোজনের পরিশীলিত শৈল্পিক মূল্যবোধে কল্পনার মাধ্যমে নির্মাণ করেছেন। তাই এখানে সত্তার নির্মাণের শৈল্পিক প্রক্রিয়ায় নির্মিত হয়েছে সামগ্রিক জীবনবোধের অভিব্যক্তির সুষমায় ব্যক্তির সমাজের সঙ্গে একটি সামঞ্জস্য। অর্থাৎ আত্মজীবনীর উপকরণে novelisation প্রক্রিয়ায় শৈল্পিক প্রতিবেদন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আত্মজীবনীতে সত্তাকে নির্মাণ করার যে-প্রক্রিয়া সেটি প্রযোজ্য হয়ে ওঠে আত্মজৈবনিক ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে। এবং নিজেকে নির্মাণ করার মধ্যে লেখকের আভিপ্রায়িক সত্যটিও প্রস্ফুটিত হতে থাকে। সেটাতে পাঠককে লক্ষ করতে হয় —

> "*The intention of the truth, as far as possible, is a sufficient gurantee of autobiographical varacity and sincerity.*"[৬]

আত্মজীবনীমূলক রচনার এই ভিত্তিটি লক্ষ করা যায় গোপাল হালদারের 'ত্রিদিবা'য়। গোপাল হালদার যিনি মননে চিন্তায় এবং দায়বোধে সম্পূর্ণতই প্রথমে একজন রাজনৈতিক সত্তা। এবং 'ত্রিদিবা' রচনায় তিনি যে অভিপ্রায়ের উল্লেখ করেছেন ও যে-সত্যটি বলতে চেয়েছিলেন সেটা তাঁর প্রতিবেদনেই স্পষ্ট রূপ লাভ করেছে। তিনি যখন 'ত্রিদিবা' লিখছেন, তখন তার মধ্যে রাজনৈতিক প্রসঙ্গটাই প্রধান ও বড় হয়ে উঠেছে। কারণ ত্রিশের দশক স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি-পর্ব থেকে '৪৮' সাল এর স্বাধীন ভারত পর্যন্ত রাজনৈতিক দাবদাহের অভিজ্ঞতার 'সত্য'টি (truth) তিনি অমিত চরিত্রের সত্তার চৈতন্যলোকের গভীরে চেতনাপ্রবাহের স্রোতে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। আর চরিত্রের মানসলোকেই তাঁর ব্যক্তিসত্তাও নির্মিত হয়ে উঠেছে। গোপাল হালদার চিঠিতে নিজের অভিপ্রায়টি স্পষ্ট করেছিলেন, যে ত্রিশের দশকের উত্তাল রাজনৈতিক বাতাবরণের উপন্যাস নাই হোক, কয়েকটি পাতায় তার আভাস রাখতে চেয়েছিলেন। সেটা এক অর্থে সেই সময়ের অশান্ত দিনের মহাকালের স্বাক্ষর ও ইঙ্গিতই বহন ও ধারণ করেছে। অর্থাৎ তিনি লিখেছিলেন, 'এক একটি দিনের মধ্যে অন্ততঃ আমার অভিজ্ঞতায় যে গভীর রহস্য পুঞ্জীভূত।'

এভাবেই লেখকের অভিপ্রায়টি এবং সত্তার সঙ্গে ইতিহাসের মহাকালের স্বাধীনতা সংগ্রামের বাস্তব রূপটির নির্মাণও লক্ষ করি। আত্মজীবনীমূলক রচনার যে-শর্ত অর্থাৎ লেখকের সত্য প্রকাশের অভিপ্রায়, বক্তব্যের প্রতি সচেতন ও সাবধান থাকতে হয়। এবং পেছন ফেরে তাকানোর বেলায় জীবনের তথ্য ও তাৎপর্যের মধ্যে পরিমিত বিন্যাস এবং বিন্যস্ত কাঠামো তৈরি করে নিতে হয়। এই ধারণাটিই সচেতন নির্মাণশিল্পী গোপাল হালদারের অমিয়বাবুকে লেখা চিঠিতে স্পষ্ট হয়। গোপাল হালদার অনেক পরে নিজের ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছিলেন —

> *"নিজের কথা নিজের বলা যথেষ্ট সাবধান ও অকৃত্রিম না হলে শুধু ব্যর্থ হয় না, নিজেকে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে ভুল পথে চালিত করে, অন্যকেও ভুল পথের নির্দেশ দেয়। অনেক বড় ও সচেতন লেখকের ও মাঝে মাঝে এই বিভ্রান্তি ঘটে। অদৃশ্য অনেক-অনেক — অনেক ... কোটি কোটি অণু-পরমাণুর ঝড় ও ঝড়ে ধাবমান ভাবাবেগের 'depot' মন বা সত্তা জেনে-না জেনে চেতনা রাজ্যের কোন্ সীমা ছাড়িয়ে কোন্ সীমায় ছুটছে। অথবা, সীমাহীনতার রাজ্যে ছুটতে ছুটতে ভাবছে — 'কে বলে এসব? আমার অস্তিত্বের কেন্দ্রে আমি চির প্রতিষ্ঠিত সত্তা এবং বৎসরের পর বৎসর সেখানে চিরই প্রস্ফুটিত।"*[৭]

আর এই চিরপ্রতিষ্ঠিত সত্তাই যখন এক-একটি দিনকে উপজীব্য করে, বিস্তৃত দুই দশকের অর্থাৎ দীর্ঘ আঠারো বৎসরের অভিজ্ঞতার সত্যকে ব্যক্ত করছেন তখন তাঁকে নিজস্ব বিষয় ও কাঠামোতে তাৎপর্যগুলোকে পর্যায়ক্রমিক বিন্যস্ত করে শৃঙ্খলা দিতে হয়েছে। তিনি একজন ব্যক্তির চৈতন্যলোকে উদ্ভাসিত করে চলেছেন অভিজ্ঞতার নির্যাসকে, কাল থেকে কালান্তরে ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনকে। আর এই বিন্যাসের ব্যাপারটিও তাঁরই ভাষ্যে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

> *"সহজ কথায়, যা এক সময়ে (যেমন 'একদা'-র সময়ে) ভেবেছি বলে বলছি তা হয়ত সম্পূর্ণতঃ সে সময়ের ভাবনা নয়– তখনকার (নিজের + পরিবার পরিজন (সামান্যতঃ) + জাতীয় পরিস্থিতির অস্পষ্ট আভাস বা compulsion (আংশিকভাবে)। ভাবনা সেই ত্রিশের-একত্রিশের পর্বের + চল্লিশ থেকে অন্তত সত্তর পর্যন্ত একাধিক জটিলতর পর্বের ভাবনা — একত্রে*

পেচিয়ে-পেচিয়ে একটা এই মুহূর্তের ভাবনায় এসে মিশে আমাকে চালিয়ে (এবং চলিয়ে) নিয়ে যায়। এই মূল জীবন (চেতনা) রহস্য মনে রেখে তারা আমার এখনকার কথাকে বিচার-বিশ্লেষণ করবেন — যাঁরা নির্বিকার রসবেত্তা পাঠক।"[৮]

অর্থাৎ এখানে লেখকের বক্তব্যের সমর্থনে আত্মজীবনীর 'retrospective awareness'-এর শর্তটি রক্ষিত হচ্ছে। এভাবেই গোপাল হালদারের লেখক চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, সচেতনতা এবং বিশেষত ব্যক্তিসত্তাটি সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষায় অভিন্ন রূপে দেখা যায়। এবং শৈল্পিক প্রতিবেদনে প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের সম্পর্কের বিন্যাসে ভিন্ন হয়ে পড়ে। শুধু রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক সত্তাটির মধ্যেই ব্যক্তি গোপাল হালদারের রাজনৈতিক সত্তার ইঙ্গিতটি স্পষ্টভাবে পাঠকের কাছে ধরা পড়ে।

বৌদ্ধিক সত্তা ধূর্জটিপ্রসাদের মূল শৈল্পিক অভিপ্রায়টিই ছিল 'ত্রিশের দশকের একজন বুদ্ধিজীবীর মানসিক অভিব্যক্তি দেখানো'। সেই বুদ্ধিজীবীর প্রথম প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ব্যক্ত হচ্ছে ভাবের রাজ্য থেকে পলায়নের বৃত্তান্ত। কিন্তু পলায়ন অসম্ভব। আর এই অভিপ্রায়টিই তিনি মন-ধার-দেওয়া চরিত্র খগেনবাবুর চরিত্রে আমরা শেষ পর্যন্ত লক্ষ করি। পলায়নের অনেক সচেতন প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে খগেনবাবুর সমস্ত উপন্যাস জুড়ে। প্রথমত রমলার থেকে পলায়নের জন্য কাশী ছুটলেন। কিন্তু অবশেষে ধরা দিতেই হল। ভিড় থেকে তিনি সবসময় পরিত্রাণ চাইতেন কিন্তু মোহানায় মার্কসীয় শ্রেণি-সংগ্রামের কাতারে তাঁকে জড়িয়ে পড়তেই হল। কারণ একজন বৌদ্ধিক সত্তা, যার মধ্যে আত্মসচেতনতা ও সমাজ-সচেতনতার বোধ প্রখর, তিনি কখনও জনস্বার্থের প্রয়োজনে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেন না। এখানে আদর্শ আত্মজীবনীর ভিত্তিপ্রস্তরে এবং লেখকের 'বড় আমি'র উত্তরণ ঘটে। মানবিক বোধে অর্থাৎ 'expressing to humanity's' এবং সমগ্রতার সন্ধানে 'approaches to totality' ও 'harmonious perfection' — অর্থাৎ সব কিছুর শুদ্ধতার প্রতি আবেগ এবং সর্বাগ্রে সমস্ত কিছুতে একটা সুষমতা নিয়ে আসা হয়। লেখক ধূর্জটিপ্রসাদের sincerity এবং perfection এখানেই যে তিনি বুদ্ধিজীবীর আত্মন্তরী জীবনের উত্তরণ দেখাতে চেয়েছেন সমগ্রতার সন্ধানে। ব্যক্তি ধূর্জটিপ্রসাদ individual-এ নয়, মূলত ভারতীয় দর্শনের সামঞ্জস্যে person-এ বিশ্বাস করতেন। অর্থাৎ ব্যক্তি (person) পাশ্চাত্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দর্শন (individual) নয়। বরং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য হয়েও সামাজিক সত্তার অন্বয়ে সহযোগী এবং সমবায়ী হবে। যেটাকে তিনি personality

বলতেন। এই personality তত্ত্বটিকেও মুখ্য চরিত্রের জীবন-সন্ধানের অভিব্যক্তিতে রূপও দিয়েছেন।

এভাবে পাঠকৃতিগুলোতে আত্মজীবনীমূলক সন্দর্ভের (Autobiographical Discourse) বৈশিষ্ট্যে, ধর্মে, রীতি-কৌশলের অবলম্বনে, ঔপন্যাসিক প্রক্রিয়ার (novelisation) শৈল্পিক মেলবন্ধন লক্ষ করি। যার ফলে এই ধরনের রচনায় আত্মজীবনী ও ঔপন্যাসিকতার দ্বৈতাদ্বৈত ভাব স্পষ্ট হয়।

শরৎচন্দ্র, গোপাল হালদার এবং ধূর্জটিপ্রসাদের প্রতিবেদনগুলোতে মূলত আত্মজীবনীর উপাদান ভিন্ন-ভিন্ন রূপে সন্নিহিত। কিন্তু তিনজনই একটি মুখ্য চরিত্র সংস্থাপন করে নিজের নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। শ্রীকান্ত, অমিত, খগেনবাবু — তিনটি সাহিত্যিক চরিত্রই নিজের ব্যক্তিজীবনের ঘেরাটোপে আবদ্ধ থাকেনি। নিজেকে জানতে-জানতে, চিনতে-চিনতে সমাজজীবনের বৃহত্তর আঙিনায় সমন্বয় সাধনে ব্রতী হয়েছে। তাই নিজের জীবন-অভিজ্ঞতা উপলব্ধ দর্শনে বৃহত্তর জনজীবন, সমাজ থেকে রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থানও স্পষ্ট হয়েছে। শ্রীকান্তের ভবঘুরে জীবনের যাত্রাকালে ঔপনিবেশিক পরাধীন ভারতের প্রতিচ্ছবি, প্রান্তিক নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি ধনিকতন্ত্রের নির্যাতন এবং নারীজাতির অবমাননায় মানবতার অবক্ষয়ের দিকটি স্পষ্ট রূপ লাভ করেছে। অমিত চরিত্রের চৈতন্যলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে দীর্ঘ আঠারো বৎসরের সংগ্রামী জনজীবনের অস্তিত্ব। ইংরেজ উপনিবেশ থেকে স্বাধীন ভারতে দেশীয় শাসকবর্গের প্রকৃত ছবি। অর্থাৎ এককথায় উত্তাল রাজনৈতিক আন্দোলনের রাষ্ট্রীয় ছবি। এবং খগেনবাবুর মাধ্যমে বৌদ্ধিক আত্মম্ভরী জীবনের নিরর্থকতা। অর্থাৎ সে সার্থক তখনই হয় যখন নিজের দম্ভ ত্যাগ করে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত হয়েও সমগ্রের সঙ্গে অন্বিত হতে পারে। অর্থাৎ তার একক সত্তা যখন অপর সত্তাকে মান্যতা দেয়। তখন নিজেও মাননীয় হয়ে ওঠে। আর খগেনবাবুর মাধ্যমে কলকাতার বৌদ্ধিক জনজীবন, ও উচ্চবিত্ত জীবন-প্রণালী, কাশীর ভঙ্গুর সমাজ-জীবন এবং শ্রেণিচেতনায় উত্তরণের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রিক বিপর্যয়ের প্রতিচ্ছবিটিও উদ্ভাসিত হয়েছে। তাই এই প্রতিবেদনগুলো সত্তার নির্মাণের সমান্তরালতায় সমাজ সচেতন সাহিত্যিকদের রচনানৈপুণ্যে সমাজতাত্ত্বিক নিদর্শনও হয়ে উঠেছে।

এই ধরনের উপন্যাসে লেখকের 'সত্য' প্রকাশের যে প্রেরণা, তার মূলে নিহিত থাকে নৈতিক মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধ সময়-সমাজ-সংস্কৃতিকে ধারণ করেই তৈরি হয়। কোনও একটি প্রতিবেদন পড়তে পড়তে যখন পাঠকের নিবিষ্ট মনে প্রতিবেদনটির বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে তা নির্ভর করে লেখকের ব্যক্ত সত্য প্রকাশের প্রতি আন্তরিকতায়। শৈল্পিক প্রতিবেদনে প্রকাশিত যে-সত্য, তার গভীরে গোপনে

কাজ করে লেখকের পরিশীলিত মনের মূল্যবোধ। তাই জীবন-উপাদানের সত্য যখন সাহিত্যের সত্যে রূপান্তরিত হয় তার মধ্যে বাস্তব ও কল্পনার দ্বিরালাপ গড়ে ওঠে। আর এই দ্বিরালাপিক বাচনই সাহিত্যে লেখকের জীবনসত্যকে প্রতিষ্ঠা দেয়। এবং জীবনকে নতুনভাবে আবিষ্কারে সুষমামণ্ডিত করে তোলে। লেখক যখন জীবনের কোনও একটি মূল্যের আলোকবর্তিকায়, বাস্তব জীবন-উপাদান ও কল্পনার শৈল্পিক মূল্যবোধের মেলবন্ধন প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন সেই সত্য শুধু ব্যক্তিগত জীবননির্ভর, বস্তুনির্ভর ঘটনা বা তথ্য না হয়ে, কখনও কখনও মহাসত্যের মর্যাদা লাভ করে। তাই বাল্মীকির রামায়ণে তিনি যে-সত্য রচনা করেছেন, কবির আন্তরিকতায়, মূল্যবোধে কবির মনোভূমিতে অযোধ্যার চেয়েও সত্য হয়ে ওঠে রাম চরিত্র। সে-সত্য মহাসত্যের মর্যাদায় ভূষিত, অভিনন্দিত। তাই সত্যের মূল্য, চরিত্র - ধর্ম নিরূপিত হয় সংবেদনশীল মানুষের মূল্যবোধের কৃতিত্বে। শ্রীকান্ত, অমিত, খগেনবাবু চরিত্রের জীবনচারণে অবলোকন করি সচেতন, সংবেদনশীল লেখকদের নৈতিক মূল্যবোধের পরিব্যাপ্তি। তাই আলোচ্য লেখকদের রচনায় জীবনসত্য প্রকাশের যে-অভিপ্রায় পরিলক্ষিত হয়, তার মধ্যে আত্মজীবনীমূলক রচনার ক্ষেত্রে সমালোচকদের ধারণা সমর্থিত হয়। অর্থাৎ যে-চরিত্রগুলোকে আধার করে লেখকের জীবনসত্য অভিব্যক্ত হল, তাদের ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও মানসিকতায় লেখকের ব্যক্তিত্ব, মানসিকতা ও চরিত্র অনুভব করা বা বোঝা গেল কিনা। আর এই সচেতন শিল্পীদের রচনাগুলোতে আমরা পাঠক এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে অবলোকন করি। উদাহরণ স্বরূপ শ্রীকান্তের মানবদরদী মানসিকতায় এবং ভবঘুরে জীবনচারণায় শরৎচন্দ্রেরই ব্যক্তিত্ব ধরা পড়ে। রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে সঠিক পথ সন্ধানের অভিযাত্রী বুদ্ধিবাদী শিক্ষিত তরুণ অমিতের ব্যক্তিত্ব লেখক গোপাল হালদারেরই রাজনৈতিক সত্তার রূপান্তরিত শৈল্পিক রূপ এবং বৌদ্ধিক সত্তা ধূর্জটিপ্রসাদের নিখুঁত যুক্তিবাদী, সচেতন মানসিক প্রকৃতি ও ব্যক্তিত্বের স্ফুরণেই সৃষ্ট হয়েছে খগেনবাবু চরিত্রটি, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তাই শিল্পের বিশ্লেষণে বলা যায় আমরা পাঠক লেখক অভিপ্রেত সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও, তাঁর বাস্তব জীবন উপাদানের ভিত্তিকে মান্যতা দিয়েও যখন শিল্পের খাতিরে কাল্পনিক অসত্যকেও বরণ করি। এবং তাঁর নৈতিক মূল্যবোধে গড়ে ওঠা প্রতিবেদনটির সামগ্রিকতা আমাদের কাছে হাজার শঙ্কা ও সংশয় অতিক্রম করে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। তার মধ্যেই লেখকের শিল্পদক্ষতায় নিহিত থাকে নান্দনিক তাৎপর্য।

শরৎচন্দ্র, গোপাল হালদার এবং ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রচনাগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায়

রয়েছে আত্মজীবনের উপকরণ। অন্যদিকে শৈল্পিক প্রতিবেদনের শর্তে গ্রহণ-বর্জন-পরিমার্জন ও সংযোজনে নির্ভরযোগ্য কল্পনার ব্যাপ্তি। আর এই দু'টি মেলবন্ধনই সাহিত্যে বর্গীকরণে নতুন দিক উন্মোচন করেছে।

শ্রীকান্তের শৈশবকালের পিসেমশাইর বাড়ির বৃত্তান্ত, ভবঘুরে, উদ্দেশ্যহীন জীবনযাপন এবং বিভিন্ন জায়গার যে-উল্লেখ আছে তা শরৎচন্দ্রের জীবনেরই বাস্তব। কিন্তু অখণ্ড শ্রীকান্ত চরিত্র শরৎচন্দ্র নন। শ্রীকান্তের মধ্যে আংশিক বা খণ্ডিতভাবে তিনি উপস্থিত থেকেই নিজের জীবনদর্শনের, পরোক্ষ অভিব্যক্তি ঘটিয়েছেন অখণ্ড সাহিত্যিক চরিত্র শ্রীকান্তের নির্মাণে।

গোপাল হালদারের ত্রিদিবার মধ্যেও আমরা তাঁর জীবনের ছায়াপাত অবলোকন করি অমিত চরিত্রের মধ্যে। স্বাধীনতার সংগ্রামে বারবার কারারুদ্ধ হওয়া, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সচ্ছল চাকুরিজীবী জীবন প্রত্যাহার করে বিভিন্ন সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকা, ইতিহাসের প্রতি ঝোঁক, জীবনে প্রতিটি মতামত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ। কিন্তু তিনি বিস্তৃত, উত্তাল সময়ের দুই দশকের অভিজ্ঞতার তাৎপর্যকে বর্ণনা করতে বেছে নিয়েছেন উপন্যাসের ঘরানাকে। কারণ স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মত্যাগী, স্বার্থত্যাগী, দেশপ্রেমী, ছোট-বড়, খ্যাত-অখ্যাত সবার ত্যাগের, উদ্দীপনার কথা বর্ণনা, বিচার-বিশ্লেষণ আত্মজীবনীর পরিসরে সম্ভব হত না। তিনি 'রূপনারানের কূলে' নামে দুই খণ্ড আত্মজীবনীও লিখেছিলেন। কিন্তু বৃহৎ জীবন অভিজ্ঞতার, উপলব্ধির আধার রূপে আত্মজীবনের বিশ্বাসে, উপাদানে, অভিজ্ঞতায় ঔপন্যাসিক প্রতিবেদন রচনা করেছিলেন।

বুদ্ধিবাদী-যুক্তিবাদী চিন্তাবিদ ধূর্জটিপ্রসাদ কাহিনি বর্জন করে চিন্তাশীল রচনায় জীবন অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও ভাবাদর্শকে রূপ দিয়েছেন একমাত্র উপন্যাস ত্রয়ীতে। সেখানে ধূর্জটিপ্রসাদের মন-ধার-নেওয়া নায়ক চরিত্র খগেনবাবু যুক্তি, তর্ক, চিন্তার মাধ্যমে জীবনের সার্থকতা, ব্যর্থতা, অর্জিত অভিজ্ঞতার তাৎপর্য ব্যক্ত করে গেছেন। এখানে ধূর্জটিপ্রসাদের আত্মজীবনী নয়। তাঁর ইনটেলেকচুয়ালিজমের ধ্যান-ধারণায় প্রচলিত সাহিত্যধারার বিপ্রতীপে একটি প্রতিসন্দর্ভ তৈরি হয়েছে। ধূর্জটিপ্রসাদ নিখুঁত, প্রকৃত জ্ঞানকে সব ডিগ্রির চেয়ে জীবনে প্রাধান্য দিতেন। তাঁর জীবনে যেমন ছিল গভীর জ্ঞানস্পৃহা, বিভিন্ন বিষয়ের 'Authentic' বই পড়ার প্রতি একাগ্রতা তাঁর মানসচরিত্র খগেনবাবুও সেই পথেরই দিশারি। ধূর্জটিপ্রসাদের বহিরঙ্গে ছিল কঠোর স্বভাবের আবরণ। যা তাকে সবসময় খুঁতখুঁতে দেখাত। ঠিক খগেনবাবুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তা-ই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই মিল বা ঐক্য শুধু মানসিক দিক দিয়ে। ফলে এটাতে আত্মজীবনের

তথ্যগত কোনও উপাদান পাওয়া মুশকিল। তাই এটাতে আত্মজীবনের কোনও উপাদানের তথ্যমিল পাওয়া যায় না। যা আমরা পাঠক অবলোকন করি তা বৌদ্ধিক সত্তার অন্তর্মিলটাই বিশেষত। তাই এটা লেখকের জ্ঞানতাত্ত্বিক চেতনারই ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনে বিধৃত অনন্য রূপ।

পরিশেষে বলা যায় যে, এই ধরনের উপন্যাসে ঔপন্যাসিকরা বৃহৎ কোনও কাল, সময় ও পরিসরে নিজের অর্জিত অভিজ্ঞতার জীবনদর্শনকেই ব্যক্ত করেন। আর নিজের বক্তব্যকে সম্প্রসারিত করতেই উপন্যাস শিল্পের আশ্রয় নেন। যেখানে একাধারে আছে নিজেকে নির্মাণ করার স্পৃহায় আত্মজীবনের উপাদানের কিছু সমাহার। অন্যদিকে কল্পনার সাযুজ্যে শিল্পসুষমায় নান্দনিক ভাষ্যও রূপ লাভ করে। এই রচনায় একদিকে তাঁরা উপস্থিতির আভাস দিয়ে খুব সন্তর্পণে নেপথ্যে চলে যান। কারণ এটি তাঁদের জীবনের প্রতিচ্ছবি নয়। আত্মজীবনীর উপাদান ও অভিজ্ঞতার তাৎপর্যের সমন্বয়ে সংগঠিত ঔপন্যাসিক প্রতিবেদন। যার মূলে অন্তর্নিহিত মানবজীবনের সামগ্রিক বোধ ও প্রতিচ্ছবির সঙ্গে বিস্তৃত কাল। সেইসঙ্গে মানুষের পরিবর্তিত মূল্যবোধের অভিব্যক্তি প্রকাশের ক্ষেত্রও এটা। এখানে রচয়িতার অস্তিত্ব মুখ্য নয়। তাঁর পারিপার্শ্বিক সমাজ, মানুষ, তাঁর অস্তিত্বকে দিয়েছে পরিপূর্ণতা।

লেখকের 'আত্ম' এবং 'পর' যেন পার্থক্য ও প্রতীতির সমান্তরালতা রক্ষা করে চলেছে এখানে। লেখকের জীবন-অভিজ্ঞতার, কিছু বাস্তব উপাদানের ছায়া পড়েছে সত্যি। কিন্তু নিজের 'আমি' সত্তাটি উপন্যাসে প্রকাশ্য নয়। তাঁর উপস্থিতি এখানে প্রচ্ছন্ন। তাই এই ধরনের রচনায় আত্মজীবনী ও উপন্যাসের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বও পরিদৃশ্যমান। এখানে একদিকে আত্মজীবনের ছায়াঞ্চলে প্রচ্ছন্নভাবে লেখকের ব্যক্তিসত্তার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে শৈল্পিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতায়, ঔপন্যাসিক প্রক্রিয়া (Novelisation)-র শর্তে কিছুটা গ্রহণ-বর্জন-সংযোজনে দ্বৈতাদ্বৈত ভাবও ব্যক্ত হয়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র :

১. Marcus Laura, Autobiographical Discourse, Criticism, Theory, Practice – Manchester University Press, Manchester & New York, 1994, page-3.

২. তদেব, page-3.

৩. Roy Pascal, Design and truth in Autobiography, London, Routledge and Kegal Paul, 1960, page-60.

৪. Marcus Laura, Autobiographical Discourse, Criticism, Theory, Practice – Manchester University Press, Manchester & New York, 1994, page-5.

৫. তদেব, page-5

৬. তদেব, page-3

৭. গোপাল হালদার, গোপাল হালদার রচনা সমগ্র ১ম খণ্ড, এ মুখার্জী এণ্ড কোং, কলকাতা-৭৩, গৃহীত সংস্করণ ২০০০, (পরিশিষ্ট অংশ), পৃঃ ৫২৭-৫২৮

৮. তদেব, পৃঃ ৫২৮